Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 1, January-June 2019
ISSN 2519-5816

বাংলার গ্রামীণ জীবন: সুলতানি আমল

সুফিয়া খাতুন*

Abstracts: Bengal was essentially agricultural country during the Sultanate period as is even today. The structure of economy in this region of the world has always been different from an industrial country. Each and every village of Bengal was composed of a number of such communities (or baradaris/ brotherhoods) who claimed themselves to have been originated from a common descent and shared a common social practices and religious believes. In term of economic evaluation, the village of Bengal were self-sufficient. Different occupational groups lived in the village with their hereditary professional skills. These occupational groups mutually supplied their needs and desires among themselves causing their physical isolation from the rest of the world. This special feature of economic organization would remain more or less unaffected years after years. The unique feature of village communities of Bengal was a harmonious co-ordination of the specialized functions of their different component groups of occupational workers. Everyone in the villages has his special occupational function assigned to him. From among the various social groups, the husbandmen, for instance, would take the activity of the tilling of land and the harvesting of crops which provide food and others agricultural produce for all members of the village community. Everyone has his contribution to make the self-sufficient village community. An important aspect of the economic life of the people was their administrative machinery. It shared the fruits of the peasant labour and employed industrial labour on a small scale. This article identifies the nature of the village community, their character, economic life, daily labour and the style of different social classess.

ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় সুলতানি শাসনের সূত্রপাত হয়। ইবনে বখতিয়ার খলজি এবং তাঁর পরবর্তী খলজি শাসকগণ মুদ্রা উৎকীর্ণ করেন। এসব মুদ্রা শুধু সার্বভৌমত্বের প্রতীক ছিলনা, বরং তা অর্থনৈতিক উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। মুদ্রার প্রচলনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটে এবং ব্যবসায় বাণিজ্য চাঙ্গা হয়। সুলতানগণ মুদ্রা প্রচলনের পাশাপাশি ব্যবসায় বাণিজ্যে পৃষ্টপোষকতা প্রদান করেন এবং নিজেরা এই বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলা সমৃদ্ধশালী হলেও প্রত্যন্ত গ্রাম অঞ্চলে তেমন অর্থনৈতিক সম্মৃদ্ধির ছোয়া লাগেনি। প্রতিটি গ্রাম সেই পূর্বের

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

অবস্থানেই ছিল। কারণ গ্রামগুলো বহু দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকার ফলে ভৌগোলিক পরিবেশ তাদের বর্হিজগত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রতিটি গ্রাম বা গ্রাম সমষ্টি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রাম সমাজ প্রধানের প্রভাব ছিল সাধারণ গ্রামবাসীর ওপর সবচেয়ে বেশী এবং সমাজ প্রধানই (মাতব্বর বা মোড়ল) ছিল তাদের নিয়ন্ত্রক। অথনৈতিক উন্নয়নে সকল পেশার মানুষ নিজের অবস্থানেই থেকে উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। কৃষক ফসল উৎপাদন করে, কুটির শিল্পে পারদর্শী ব্যক্তি নির্দিষ্ট পণ্য উৎপাদন করে। ব্যবসায়ী, কামার, কুমার, গোয়ালা, তাঁতী, দর্জি, মিস্ত্রি, মুকেরী, নাপিত, ধোপা, কাজী, গায়ক প্রভৃতি পেশার গ্রামীণ সম্প্রদায় তার পেশার সমস্ত দায়িত্ব পালন করে গ্রামকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করে। কিন্তু তারা নিজেরা কখনও অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বচ্ছল ছিল না। ফলে অনেক পেশাজীবীর দিন কাটে অনাহার, অর্ধাহারে।

গবেষণা পদ্ধতি

সুলতানি আমলের বাংলার গ্রামীণ জীবন বলতে, ১২০৪- ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার গ্রামীণ জীবনকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়া বাংলা বলতে বাংলাদেশ ও ভারতের সমন্বয়ে গঠিত ভূ-ভাগকেই নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক গ্রন্থ- সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলকের *ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী*, জিয়াউদ্দিন বারানীর *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, ইবনে বতুতার *The Rehla of Ibn Battuta*, Amir Khusraw- the poet sufis and sultans প্রভৃতি গ্রন্থগুলোকে মৌলিক উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। গৌণ উৎসরূপে সুলতানি আমলের বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাংলার গ্রামীণ জীবন ঔপনিবেশিক শাসনামল, মুঘল শাসনামলে বাংলার গ্রামীণ জীবন এবং আধুনিক বাংলার গ্রামীণ জীবন নিয়ে বিস্তর গবেষণা হলেও সুলতানি আমলে বাংলার গ্রামীণ জীবন সম্পর্কিত গবেষণা অপ্রতুল। আলোচ্য প্রবন্ধে সুলতানি আমলে বাংলার গ্রামের কাঠামো, গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষের জীবনমান, অর্থনীতিতে বিভিন্ন পেশার ভূমিকা, তৎকালীন সময়ে বাংলায় উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের বিবরণ, কৃষিনির্ভর কুটির শিল্প, গ্রামীণ কৃষক সমাজের বিনোদন ও উৎসব প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মূলত সুলতানি বাংলার গ্রামীণ জীবনের সার্বিক চিত্র তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সুলতানি বাংলার গ্রাম সম্পর্কিত তথ্য অপ্রতুল হওয়ায় বর্তমান প্রবন্ধে তার বিশদ বিবরণ উপস্থাপনের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এখান থেকে গ্রামীণ সমাজ, কৃষক ও অন্যান্য পেশাজীবীদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। সুলতানি বাংলার কৃষি অর্থনীতি ও গ্রাম সম্পর্কে আগ্রহী গবেষক ও পাঠকগণ আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে উপকৃত হবেন।

প্রেক্ষাপট

গ্রাম বাংলার প্রাণ। বাংলার অর্থনীতির মেরুদণ্ড বলা যায় গ্রামকে। দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন, শাসকদের সফলতা ও ব্যর্থতা কোনো কিছুই গ্রামবাসীকে প্রভাবিত করতে পারত না। গ্রামের সাথে প্রশাসনের সম্পর্ক নির্ধারিত ছিল একটি মাত্র বিষয়কে কেন্দ্র করে আর তা হলো রাজস্ব আদায়। এসময়ে বাংলার প্রতিটি গ্রামের গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণ করত গ্রামের উচ্চতর শ্রেণী।[১] সুলতানগণ তাদের ইচ্ছেমত রাই/ রায়, রায়ান ও মুকাদ্দমদের (খট বা সর্বোচ্চ কৃষকদের বলা হত) দ্বারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি রাজস্ব আদায় করাতেন। কৃষকদেরকে ভূমি রাজস্ব ছাড়াও অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হতো। যেমন-পশুচারণ কর (চরাই) ও গৃহকর (ঘরি)।[২] মূলত,

সুলতানি শাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের সব জমি চাষের আওতাধীন ছিলনা বলে ধারণা করা হয়। ফলে দেশে অনেক জলা, পতিত ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ জমি ছিল। যা পশু চারণের জন্য ব্যবহৃত হতো। একারণে কৃষি জমির পরিমাণ অধিক ছিল না। কৃষকের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর আদায় করায়[৩] তাদের জীবনমানের কোনো উন্নতি ঘটেনি। কৃষকের জমির ফসলের বড় অংশ সরকারি খাজনা মেটাতে চলে যেতো। ফলে বছরের অধিকাংশ সময় তাদের দিন কাটত অনাহারে অর্ধাহারে।[৪] গ্রামগুলো সবসময়ই গতানুগতিক ও অনগ্রসর ছিল। তবে গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রমে অভিজাতবর্গের জীবনমানের অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়। কিন্তু গ্রামের অন্যান্য শ্রেণি পেশার মানুষের জীবনমানের কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা একই অবস্থানে রয়ে গেছে।

গ্রামের সাধারণ চিত্র

বিশ্বের অন্যান্য শিল্প সম্মৃদ্ধ দেশ ও বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে অনেক ব্যবধান রয়েছে। বাংলার উৎপাদনের উৎস ছিল জমি ও তার উর্বরাশক্তি। এছাড়াও ছিল জমি চাষের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক উপকরণ যেমন- কাঠের লাঙ্গল, দাঁতালো মই, কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি। তৎকালীন সেচখালের মাধ্যমে জমি চাষ করার পদ্ধতি খুব বেশী কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করেই ফসল কম ও বেশী উৎপাদিত হতো। ভালো বৃষ্টি হলে ফসল ভালো হতো। খড়া, অনাবৃষ্টি হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। শহরের কাছাকাছি দুই একটি গ্রাম ছাড়া প্রায় সকল গ্রামের গ্রামীণ জীবনই ছিল সহজ, সরল, গতানুগতিক ও অনগ্রসর। একই বংশের লোকেরা কাছাকাছি কয়েকটি গ্রামে বাস করত। এরকম কয়েকটি গোষ্ঠীর পাশাপাশি অবস্থানের মাধ্যমেই এক একটি গ্রাম গঠিত হতো।[৫] গ্রামের সাধারণ লোকজন যে কোনো সমস্যা হলে সন্ন্যাসী ফকিরের শরণাপন্ন হতো এবং তাদের দরগায় শিরনি চরাত।[৬] সারাজীবন তারা ভালো কিছু পেতো না বলে তাদের জীবনে কোনো আশা-আকাঙ্খা ছিল না।[৭] তাদের মধ্যে বহু কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। জ্যোতিষ-গণনা, ঝাঁড়-ফুঁক, মন্ত্র-তন্ত্র, তুক-তাকের প্রতি লোকের অগাধ বিশ্বাস ছিল। ওঝা মন্ত্র পড়িয়া ভুত ছাড়াত ও বিভিন্ন রোগ সারাত।[৮] এই কারণেই বাংলার কৃষক বা কৃষিজীবীদের জীবনযাপন ছিল কুসংস্কারাছন্ন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের জীবনযাপন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বাংলার গ্রামের কাঠামো

কৃষকদের জীবনের প্রতিকূল অবস্থার মাঝেই তাদের জীবন-সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা উদ্ভূত হয়েছিল এবং তারই ধাঁচে গড়ে উঠেছিল বাংলার গ্রামীণ সমাজ। অর্থনৈতিক বিচারে গ্রাম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একক এবং এর অর্থনৈতিক কাঠামো সুসংগঠিত ও উন্নত। গ্রামবাসীদের সহযোগিতামূলক মনোভাব ও মিলে মিশে কাজ করার মানসিকতা থেকে তাদের জীবন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কৃষকরা সবসময় নিবেদিত প্রাণ হয়ে পরিশ্রম করত। তাদের মূলকাজই ছিল সমাজের প্রতিটি লোকের চাহিদা ও আকাঙ্খা পূরণ হয়। মূলত মুসলিম বাংলার গ্রামগুলোকে যদি পৃথিবীর অন্য সব অঞ্চল থেকে সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রাখা যায় তাহলেও এর আর্থিক সংগঠন মোটামুটিভাবে অক্ষতই থাকে।[৯] বাংলার গ্রামীণ সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- নানান পেশার বিশেষজ্ঞ লোক। যারা এই সমাজের এক একটি অংশ, প্রত্যেকের জন্য এক একটি ব্যবসা নির্দিষ্ট ছিল। যেমন- কাপড় প্রস্তুত করত জোলা, বলদের

পিঠে জিনিস নিয়ে ফেরী করত মুকেরীরা। সানাকাররা তাঁত তৈরি করত এবং রংরেজ নামের পেশাজীবীরা বিভিন্ন কাপড়ে রং করত। এছাড়া হাজাম, তীরকর, দরজি, কসাই, গোয়ালা, তিলি, নাপিত, কামার, কুমার, ময়রা, ধোপা, ডোম, মুচি প্রভৃতি শ্রেণি পেশার লোক ছিল।[১০] যে শিশু যে পরিবারে জন্ম নেয় তাকে ঐ বিশেষ পেশার উপযোগী করে গড়ে নেওয়া হয়। যেমন, কৃষকের দায়িত্ব পল্লীর প্রতিটি লোকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা। এজন্যই সে জমি চাষ করে, ফসল ফলায়, উৎপন্ন ফসল কেটে গোলাজাত করে। অন্য সকলে কোনো না কোনো ভাবে এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়। ছুতোররা লাঙ্গল, কাঠের অন্যান্য যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত করে। কৃষকরাই তাকে প্রয়োজনীয় কাঠ যোগায়। কামার যন্ত্রাদিতে ব্যবহার্য লোহা সরবরাহ করে এবং প্রয়োজনে মেরামতের কাজও করে। কুমার গৃহস্থালির জন্য প্রয়োজনীয় বাসনপত্র বানায়। মুচি লাঙ্গলের সাজসরঞ্জাম ও জুতো বানায় এবং মেরামত করে। কিন্তু মুচিদের সমাজে কোন মূল্য ছিল না।[১১] উল্লেখ্য যে, গ্রামের জীবনযাত্রা পরিচালনায় প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অবদান থাকে। ক্ষেতের ফসলকে কেন্দ্র করে গ্রামে নানাবিধ কুটিরশিল্প গড়ে ওঠে যেমন- দড়ি ও ঝুড়ি বানানো, চিনি উৎপাদন, তৈল ও গন্ধদ্রব্য তৈরি ইত্যাদি শিল্প। গ্রামের এসব উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময় করার জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থাকে। প্রতিটি গ্রামের নির্দিষ্ট অঞ্চলে একটি ছোট্ট বাজার বসে। ঐ বাজারে ছোটখাটো দোকানদাররা পণ্যশস্য, বস্ত্র, এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করে।[১২] প্রতি বছর বাংলা নববর্ষে গ্রামে গ্রামে মেলা বসে। এ মেলা থেকে কৃষকরা বিলাসদ্রব্য সংগ্রহ করে। যেমন- তামা ও সঙ্কর ধাতুর বাসন, সীসা ও চুমকির গয়না, শিশুদের খেলনা ইত্যাদি। গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের গ্রাম ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম ছাড়া বাইরের দুনিয়া এক বড় রহস্যময় জগত।[১৩] গ্রামের বাইরে অন্য কোনো অঞ্চল নিয়ে তারা মাথা ঘামাত না।

শহর ও গ্রামের মানুষের জন্য ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করাই ছিল কৃষকের প্রধান কাজ। নদীপথে কাঁচামাল আমদানি করার সুবিধা থাকার জন্য নদীর পাশ্ববর্তী অঞ্চলে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। বাংলা ও গুজরাটে শিল্পাঞ্চল লক্ষ্য করা যায়। কারণ উভয় প্রদেশেই জাহাজযোগে পণ্য আমদানি রপ্তানির সুবিধা ছিল।[১৪] বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের কৃষিই জীবিকা ছিল এবং কিছু ধনী লোক বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন করত।[১৫] শহরে বিভিন্ন সংস্কার এবং উন্নয়ন ঘটলেও গ্রামীণ সমাজ সংস্কারের জন্য অর্থ ব্যয় করার মতো দৃষ্টিভঙ্গী শাসকদের ছিল না। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষকদেরকে আর্থিক জীবনের সর্ব নিম্নস্তরে রাখা। দেশের গ্রামীণ সমাজের জনগণের আরাম ও স্বাচ্ছন্দের কোনো নির্দিষ্ট মান ছিল না। ফলে শাসক শ্রেণির পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সহজ ছিল।

মুসলিম বাংলার কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ

বাংলার অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক হলেও কৃষকরা সাধারণত জমির মালিক ছিল না। তারা চুক্তিভিত্তিক (আধা/বরগা) উচ্চ মহলের কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জমি আবাদ করত। কৃষকগণ সবসময় ভীত থাকত মালিকগণ যে কোনো সময়ে কৃষকের ফসল দাবী করতে পারত।[১৬] অর্থাৎ দেশের শাসকশ্রেণি কৃষকের শ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল এবং উৎপাদনের বেশীর ভাগ অংশই তারা ভোগ করত। একই সঙ্গে তারা শিল্পকারখানা গড়ার দিকে কোনো রকম নজর না দেওয়ায় শ্রমজীবি শ্রেণির বিকাশ ঘটেনি।[১৭] কে এম আশরাফ উল্লেখ করেন যে, সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন,

উৎপাদন ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতি প্রভৃতির মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাসকগণ উদাসীন ছিলেন। আবার শাসকগণ কোনো সময়েই প্রজাদের উপস্থিতি কামনা করতেন না।[১৮] কৃষকরা শুধু কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্নই করত কিন্তু সে ফসলের মালিক তারা ছিল না। কৃষকরে ফসলের ভাগ বাটোয়ারার দায়িত্ব জমির মালিক জোর করে নিয়ে নিতো। এই ভাগের পর শেষ পর্যন্ত দেখা যেতো খুব সামান্য ফসলই ঐ কৃষকের ভাগ্যে জুটত।

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি যেমন- ১. রাই / রায়, ২. খোত, মুকাদ্দম ও ৩. গ্রামীণ সমাজের কৃষক। কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল গ্রামীণ সমাজকে অবশ্য জিয়াউদ্দিন বারানী দু ভাগে ভাগ করেছেন যেমন- ১.কৃষক প্রধান খোত ও ২.দরিদ্র প্রান্তিক চাষি।[১৯] সমাজের একেবারে শীর্ষে ছিলেন রায়, রায়ানরা। তুর্কি শাসকগণ এদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন (তারা শস্য কাটার পূর্বেই জমির শস্য পরিদর্শন করে রাজস্ব নির্ধারণ করতেন)। এই কাজের বিনিময়ে তারা নিস্কর জমি ও রাজস্বের একাংশ পেতো।[২০] খোত মুকাদ্দমরা ছিলেন একাধারে কৃষক এবং রাজস্ব আদায়কারী। সাধারণ কৃষকের শোষণ করা অর্থে তারা ঘোড়ায় চড়ত, দামী পোশাক পড়ত এবং স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের কাছ থেকে তারা কিসমৎ-ই-খোতি নামে বাড়তি একটি কর আদায় করত।[২১] সমাজের সবচেয়ে বেশী শোষিত ছিল ৩য় শ্রেণীভুক্তরা (কৃষকরা)।[২২] বারানীর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সমাজের ৩য় শ্রেণীর বা কৃষকদের উপর করের চাপ ছিল খুব বেশি।[২৩] তাছাড়া সুলতান আলাউদ্দিন খলজি যে মূল্য নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি চালু করার ফলে রাজস্বের বেশির ভাগ অংশই রাজকোষে জমা পড়ে। ফলে গ্রামীণ কৃষক সমাজে দুরাবস্থা দেখা দেয়। মোরল্যান্ড বলেন যে, ৫০ শতাংশ ভূমিকর ছাড়াও কৃষকদের চরাই ও ঘরি কর দিতে হতো। এজন্যই তাদের জীবনযাত্রার মানের উন্নতি হয়নি।[২৪] একদিকে রাজস্ব ধার্যের সময় সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট উৎপাদন গড় অনুযায়ী জমির উৎপন্ন ফসল ধার্য করা হতো। অন্যদিকে তার মূল্য ধার্যের সময় প্রচলিত বাজার মূল্য নয়, সরকারের নির্ধারিত মূল্যই প্রয়োগ করা হতো। এতে কৃষকরা উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ফলে কৃষকের উপর করের পরিমাণ বেড়ে যেতো। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে গুজরাট, মালব, দাক্ষিণাত্য ও বাংলায় ভূমি রাজস্বের হার বাড়িয়ে দেন। আবার ফিরুজশাহ তুঘলক বাংলায় আক্রমণ করলে তিনি এক ঘোষণাপত্রের মারফত জমিদারদের ভূমি রাজস্ব মওকুফ করার প্রতিশ্রুতি দেন।[২৫] কৃষকদের উপর অত্যাধিক কর আরোপ করায় দোয়াব অঞ্চলে দীর্ঘ সময় ব্যাপী বড় ধরণের কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল। ইবনে বতুতা ১৪৩২ খ্রিস্টাব্দে আলিগড় (কোল) অঞ্চলে বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছিলেন। মূলত, দোয়াব অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহ, চাষের ক্ষতি ও উৎপাদন হ্রাসের ফলে দিল্লি ও তার আশেপাশের অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে।[২৬] ফলে খাদ্যশস্যের দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যায় এবং এ অবস্থা বেশ কয়েক বছর (১৩৩৫-১৩৪২ খ্রি.) ধরে চলছিল।

গ্রামের উৎপাদিত বিভিন্ন ফসল

মানুষ ও পশুর সকল খাদ্যদ্রব্যই গ্রামের কৃষকরা উৎপন্ন করত। কারিগরী কাজে যারা যুক্ত ছিল তারা ছাড়া আর সবারই পেশা ছিল কৃষিকাজ। পূর্বের ও বর্তমানকালের কৃষিজাত পণ্য ছিল প্রায় একই। ভেষজ লতাপাতা, মশলা, সুগন্ধি কাঠ, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, গম, যব, জোয়ার, মটরশুটি, চাল, তিল, তৈলবীজ, ইক্ষু এবং তুলা প্রধান প্রধান ফসল ছিল।[২৭] বিখ্যাত মুসলিম

ঐতিহাসিক আমীর খসরু অবশ্য ভারতে আম, কলা ও পান উৎপাদনের কথা উল্লেখ করেছেন।[২৮] এসব দ্রব্য বাংলায়ও অনেক বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হতো। বাংলার উৎপাদিত এসব শস্য দিল্লিতেও যেতো। সিরসুতী চাল উন্নত মানের শস্যের মধ্যে অন্যতম ছিল এবং দিল্লির বাজারে এই চালের খুব চাহিদা ছিল। সাধারণত শস্য-গোলা বা খত্তিতে শস্য মজুত করা হতো।[২৯] এসব গোলায় শস্য অনেক দিন সংরক্ষিত থাকত। বাংলায় উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা, সরিষা, তিল, তিসি, কলাই, পিয়াজ, রসুন ছাড়াও ডুমুর, লেবু, কলা, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি। সাধারণত মশলার মধ্যে মরিচ, আদা ও অন্যান্য কিছু মশলা বাংলা ও গুজরাটের কয়েকটি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মাত এবং এসবই গ্রামে উৎপাদিত হতো। বাংলার সমুদ্র উপকুলবর্তী অঞ্চলগুলোতে নারকেল[৩০] জন্মাত।

বাংলার সুলতান ও শাসকগণ নতুন নতুন কৃষিজ দ্রব্যাদি উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করেন। এসময়ে প্রচুর রেশম তৈরির জন্য তুঁত গাছের চাষ শুরু হয়।[৩১] এসব গাছের চাহিদা ছিল প্রচুর। এসব রেশম তৈরির সাথে অনেক লোক জড়িত ছিল। রেশম ছাড়াও বাংলায় লবণ তৈরির সাথে গ্রামের এক শ্রেণির লোক জড়িত ছিল। যারা মোলঙ্গী নামে পরিচিত ছিল। বংশগতভাবেই এ পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করেন।[৩২] বাংলায় অনেক ফুলের চাষ হতো। ফুল চাষের সাথে জড়িত ছিল মালি পেশার লোক। মালির স্ত্রী মালিনী নামে পরিচিত। মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বলেন যে,

মালি বসে গুজরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউড় গড়ে ফুলে ঘর
ফুলের পুটলি বান্ধে সাজি দণ্ড করি কান্ধে
ফিরে তারা নগরে নগর।[৩৩]

বিজয় গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্যে লখিন্দরের বিয়েতে নয়শত মালির বরযাত্রী গিয়েছিল। দ্বিজরাম দেব বলেন, মারাকারে রোপে পুস্পবন।[৩৪] তৎকালীন বাংলায় দুই শ্রেণির মালির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। যথা: ১.ভুঁইমালি ও ২. ফুলমালি। ভুঁইমালি: ভুঁইমালির কাজ বাড়ি-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আবর্জনা দূর করা। মুসলিম শাসনের শুরু হলে এই বৃত্তির লোকদের আবির্ভাব বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানকালে ভুঁইমালিদের অনেকেই গ্রামের হাট-বাজারে ঝাড়ু দেবার কাজ করে থাকে এবং বাজার চলাকালে দোকানীদের নিকট থেকে 'তোলা' নিয়েই জীবন ধারণ করে। কেউ বা ঝাড়ু তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। ফুলমালি: এদের কাজ বাগান তৈরি করা এবং ফুলের পরিচর্যা করা। কখনো কখনো ফুলমালিরা সপরিবারে একই মালিকের গৃহে বংশানুক্রমিকভাবে কাজ করে থাকে। ফুলমালি বাগান থেকে ফুল সংগ্রহ করে ধনী গৃহে বা বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে বা অনুষ্ঠানে ফুল বা ফুলের মালা সরবরাহ করে থাকে।[৩৫] অঞ্চল বিশেষে মালি সম্প্রদায়কে ফুলের পসরা সাজিয়ে হাটে-বাজারে বিক্রি করতেও দেখা যায়।

গ্রামীণ উৎপাদন ও কুটির শিল্প

কৃষিজাত পণ্যকে ভিত্তি করে গ্রামে কিছু সংখ্যক কারিগরী ও শ্রমশিল্প গড়ে উঠেছিল। এই সব শিল্প বংশগত ছিল এবং যন্ত্রপাতিও ছিল মান্ধাতা-আমলের। তাছাড়া তাদের কাজের সকল পদ্ধতিগুলোই ছিল কলাকৌশলহীন ও অবৈজ্ঞানিক। ফলে উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণও ছিল কম।

বংশ পরম্পরায় একই পেশায় লেগে থাকার জন্য এই সব কারিগরগণ নৈপুণ্য ও কর্মদক্ষতার অধিকারী হতো। কাজেই তারা যা তৈরী করত সেসব দ্রব্যগুলোর শৈল্পিক মূল্য ছিল অসাধারণ।[৩৬] কিন্তু প্রতিকূল সামাজিক অবস্থা ও সীমিত সুযোগ সুবিধার কারণে পল্লী কারিগররা একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ফলে তাদের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হতো না।

বাংলার কৃষিজাত দ্রব্য থেকে তৈরি প্রধান শিল্পপণ্য ছিল অপরিশুদ্ধ চিনি, সুগন্ধিজাত দ্রব্য। এদেশের অনুকূল পরিবেশের সহায়তায় নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে গন্ধদ্রব্য ও সুরভিত জলের শিল্প গড়ে উঠেছিল। যেমন, বাংলার গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ীরা 'গন্ধ-বণিক'[৩৭] নামে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণি হিসেবেই পরিচিতি ছিল। কোনো কোনো অনুষ্ঠানে আনন্দ উপলক্ষ্যে গোলাপজল ছিটানোর রেওয়াজ ছিল। মালিক মহম্মদ জায়সী বিশেষ দু'রকম তীব্র গন্ধযুক্ত আতরের নাম উল্লেখ করেছেন- 'মৈদু' ও 'চুবাই' কিন্তু এরা যে কিসের গন্ধ নির্যাস তা সঠিকভাবে বলা হয়নি।[৩৮] বাংলায় অপরিশুদ্ধ চিনি, মহুয়া ও ভাত থেকে বিয়ার প্রস্তুত করা হতো। আমীর খসরু উল্লেখ করেন যে, আখ থেকেও উগ্র পানীয় তৈরি হতো।[৩৯] এছাড়া খেজুরের রস ও তালের রস থেকেও এক শ্রেণির উগ্র পানীয় তৈরি হতো। বাংলায় সবরকম উগ্র পানীয় তৈরী করার সুবিধা ছিল এবং এখানে খোলা বাজারে মদ বিক্রী হতো। অন্যান্য প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তেল উল্লেখযোগ্য। ঘানিতে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তেল বের করা হতো এবং এই প্রক্রিয়া এখনও অনেক স্থানে চালু আছে।

তাঁতীরা তাঁতে কাপড় বুনত। তৈরি কাপড় খণ্ড হিসেবে বিক্রী হতো, কখনও কখনও আবার ওজন দরেও লোকে কিনত। নগদ টাকার পরিবর্তে অথবা অন্য কোনো দ্রব্যের বিনিময়ে কাপড় বিক্রী করা হতো। কুটিরশিল্পের মধ্যে ছিল গামলা, পেয়ালা, ইস্পাতের বন্দুক, ছুরি, কাচি, টুপি তৈরি করা, জুতো বানানো ও সবরকম অস্ত্র নির্মাণ। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে তীর ধনুকই বেশী তৈরী হতো বেত দিয়ে তীর ও ইস্পাত দিয়ে তীরের ফলা তৈরি করত। কর্মকাররা লৌহ-আকরিক গলানোর পদ্ধতি জানত।[৪০] কৃষি সংক্রান্ত বিবিধ যন্ত্রপাতি ও নানারকমের লোহার অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও তারা নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ জিনিসও তৈরি করত। যেমন- তালা, চাবি, ক্ষুর ইত্যাদি। বাংলায় এক শ্রেণীর কারিগর ছিলেন যাঁরা শাঁখা থেকে নানারকম গয়না তৈরী করতেন।[৪১] পিতলের কারিগররা জগ, পেয়ালা, থালাবাসন, রান্না-বান্নার বাসনপত্র, পানের বাটা ও অন্যান্য কার্যোপযোগী বাসনপত্র তৈরি করত। এমনকি ঢাক এবং অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বানানোর জন্যও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় ছিল। এসব ছাড়া দড়ি, ঝুড়ি, মাটির পাত্র চামড়ার বালতি, হাতপাখা ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিস বানানোর জন্যও বিভিন্ন কারিগর ছিল।[৪২] মূলত নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র কারিগররা তৈরি করতে পারতেন, আর এজন্যই তারা ছিল স্বনির্ভর।

আর্থিক জীবন-মান

বাংলার গ্রামবাসীদের আর্থিক জীবনমান ছিল অনুন্নত। কৃষকদের জমির ফসলের বড় অংশ সরকারী খাজনা ও খাজনাতিরিক্ত বিবিধ পাওনা মেটাতে চলে যেতো। অবশিষ্টাংশের মধ্যে কিছু অংশ গৃহস্থালির কাজে লাগত ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত দিন মজুরদেরও কিছু দেওয়া হতো। বাঁকি অংশ কৃষক নিজেদের পারিবারিক ব্যবহারের জন্য রেখে দিতো। দেবতার পরে পুরোহিতগণও

উৎপন্ন ফসলের ভাগীদার ছিল। ফসলের একটি ভাগ তাদের নামে নির্দিষ্ট থাকত। এছাড়া কৃষকদের গৃহপালিত পশুদের জন্যও ফসলের কিছু অংশ ব্যয় হতো। গৃহভৃত্য, কামার, কুমোর, ছুতোর, ধোপা ইত্যাদি পেশাজীবীরা অন্যদের চেয়ে এক অর্থে ভালো ছিল। কারণ কোনো গৃহপালিত পশুর খাবার যোগানোর চিন্তা তাদের করতে হতো না এবং পুরোহিতদেরও দান করতে বাধ্য ছিল না।[৪৩] তাদের অবজ্ঞাত ও নিঃসঙ্গ জীবন এক দিক থেকে নিরাপদ ছিল। কৃষিজীবীদের মতো এরাও এদের সামান্য সংস্থান পারিবারিক উৎসব ও প্রথা-নিয়ম পালনেই ব্যয় করে ফেলত। গ্রামের কৃষকগণ ফসল উৎপাদন করলেও সমস্ত ব্যয় নির্বাহের পর তার কোনো পুজিই হাতে থাকত না। এজন্য প্রত্যেক কৃষকই মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত থাকত। ঋণগ্রস্থ কৃষকগণের কাছ থেকে মহাজন সুদের টাকা আদায় করতে কার্পন্য করত না। ফসল উঠার সময়ে তারা সুদের টাকার পরিবর্তে কৃষকের কাছ থেকে ফসল সংগ্রহ করতো কিন্তু এরপরও দেখা যেতো ঐ কৃষকের সুদের টাকা কোনভাবেই কমেনি। এসব কৃষকের পরিবারের সদস্যদের গায়ে কোনো ভাল কাপড় জুটত না এবং তাদের ঘরে কোনো আসবারপত্র ছিলনা। 'তারা প্রায় নগ্র অবস্থায় থাকত।'[৪৪] এটা থেকেই তাদের বস্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আর তাদের আসবাবপত্র বলতে চৌকি ও রান্নার জন্য দুই তিনটা বাসনপত্র। গ্রাম বাংলার কৃষকের স্ত্রীগণ মোটা ভাত কাপড়েই সন্তুষ্ট ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার ছিল তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

গ্রামের বিনোদন ও উৎসবাদি

গ্রাম বাংলায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করত এবং তাদের ধর্মীয় উৎসব আলাদা থাকলেও তারা এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের উৎসবে অংশগ্রহণ করত। যেমন মুসলমানরা হোলি খেলত এবং হিন্দুরা মহরমের শোভাযাত্রায় যোগ দিতো।[৪৫] মুসলমানদের প্রধান দুটি উৎসব হল ঈদ-উল-ফিতর (৩০ দিনের রোযা শেষে শাওয়াল মাসের প্রথম দিনে পালন করা হয়) ও ঈদ-উল-আযহা (রোযার ঈদ এর দু'মাস পর হজ্জের শেষে ১০ই দারুল হজ্জ, ঈদ-উল-আযহায় গরু, ছাগল, মহিষ প্রভৃতি কোরবানী করা হয়)।[৪৬] অন্যান্য যে সব অনুষ্ঠান পালন করা হতো তাহলো ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (১২ই রবিউল আওয়াল হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর জন্মদিন বা খুশির দিন), শব-ই-বরাত, (Night of Assignment), শবে কদর, আশুরা প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে ইবাদত, খাওয়া দাওয়া ও আনন্দ উৎসব সবই হতো। হিন্দুদের উৎসবের মধ্যে রয়েছে- দূর্গা পূজা, কালী পূজা, স্বরসতী পূজা, দোল পূর্ণিমা এবং আরো অন্যান্য পূজা পার্বণ। এছাড়া নবজাতকের নামকরণ উৎসব আকিকা পালন করা হতো। ছেলে শিশু হলে বড় করে অনুষ্ঠান করা হতো।[৪৭] হিন্দু মুসলিম উভয় পরিবারে পুত্র জন্ম গ্রহণ করলে শুভ লক্ষণ এবং মেয়ে জন্ম নেয়াকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করত। এজন্য তেমন কোনো আয়োজন করা হতো না।[৪৮] উল্লেখ্য যে গ্রামীণ বড় সামাজিক অনুষ্ঠান ছিল বিবাহ অনুষ্ঠান। নিম্নবিত্তদের পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে কোনো মতামত ছিল না এবং সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল।

আনন্দ বিনোদনের উপকরণ হিসেবে গানের চর্চা ছিল। মাহুয়ান একশ্রেণির পেশাদার গায়কের কথা উল্লেখ করেন। গান শুরু হতো নিম্ন সুরে আর শেষ হতো চড়া গলায়।[৪৯] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, এক শ্রেণির বাজিকরেরা পশুর কৃত্রিম লড়াই দেখিয়ে জনসাধারণের আনন্দের খোরাক জোগাত। তিনি কোনো এক দল লোকের পোষা বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখে খুশি

হয়েছিলেন। লড়াই এর সমস্ত পদ্ধতি ছিল কৃত্রিম, তবে দৈহিক শক্তিসম্পন্ন। পশুর সঙ্গে মানুষের খালি গায়ে খেলা চলত, জনতা ভিড় করে দেখত।[৫০] গ্রামের লোকজন টাকা উপার্জনের জন্য এসব খেলা দেখাতে শহরে যেতো। আজও পল্লী গ্রামের বিভন্ন জায়গায় বানর খেলা দেখতে পাওয়া যায়। অক্লান্ত কঠোর পরিশ্রমের পর শ্রান্তি বিনোদনের জন্য গ্রামীণ জনসাধারণ নানা ধরণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করতেন। যেমন-পুঁথি পাঠ, কবি পালা, যাত্রা গান, পুতুল নাচ প্রভৃতি। খেলাও বিনোদনের অংশ ছিল। বিভিন্ন খেলার মধ্যে ছিল-সাঁতার কাটা, নৌকা বাইচ, ষাড় লড়াই, মোরগ লড়াই, বানর খেলা, হাডুডু, বলি খেলা, লাঠি খেলা ও কুস্তি লড়াই প্রভৃতি।[৫১] গ্রামের এসব খেলার মধ্যে কিছু কিছু খেলা আজও পল্লীগ্রামের কোনো কোনো অঞ্চলে দেখা যায়।

পান, সুপারী গ্রামীণ পুরুষ মহিলাদের নিত্যদিনের খাবার হলেও বিয়েও বিনোদনের সময়গুলোতে তারা সুগন্ধিযুক্ত পানের আয়োজন করত। পান ছিল আমন্ত্রণ জানানোর একটি মাধ্যম। দৌলত খান লোদী বাবরকে ভারতে আমন্ত্রণ জানাতে কাবুলে তাঁর নিকট পান প্রেরণ করেছিলেন।[৫২] মেহমানকে পান দিয়ে আপ্যায়ন করাকে সম্মান ও মর্যাদার বলে মনে করা হতো। অন্যদিকে গ্রামগুলোতে তামাক খাওয়া বাঙালিদের বদাভ্যাস ছিল। নলের হুক্কার সাহায্যে তারা ধূমপান করত। ধূমপান প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। বিভিন্ন ধরণের হুক্কা (দেশীয় জলনালী)- দু' হাত নলসহ হুক্কা, আবার নল ছাড়া হুক্কা প্রচলিত ছিল। উচ্চবিত্তরা মদপান করত কিন্তু সমাজের সাধারণ জনগণের পক্ষে অর্থ ব্যয় করে মদপান করার সামর্থ ছিল না। গ্রামের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার তেমন রদবদল না হওয়ায় তারা একই অবস্থায় ছিল।

উপসংহার

এটা অনস্বীকার্য যে, গ্রামীণ ও শহুরে সাধারণ জনগণ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই অন্যান্য পেশাজীবীর তুলনায় কৃষকদের বেশী খাটতে হতো। বছরের কয়েকটা ঋতুতে তাদের প্রায় দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করতে হতো। তবে কৃষকের স্ত্রী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেটে কৃষকের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি যথাসাধ্য লাঘবের চেষ্টা করত। সকলের সম্মিলিত কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যদি রোজ দুবেলা পেটভরে খেতে পারত, তাহলেই তারা নিজেদের পরম সৌভাগ্যবান মনে করত। গ্রামের কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুবই অল্প তথ্য পাওয়া যায়, তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, তাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। বছরের অধিকাংশ সময়ই তাদের দিন কাটত অনাহারে অর্ধাহারে। তাদের কোনো ভাল কাপড় ও আসবারপত্র ছিল না। গ্রাম বাংলার কৃষকের স্ত্রীগণ মোটা ভাত কাপড়েই সন্তুষ্ট ছিল। স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকার ছিল তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটুনিতে জর্জরিত গ্রাম্য বধুর 'বিশ্রামের রাত যেন শেষ না হয়' আকুতি হয়তো এখনও বাংলার নিভৃত পল্লী গ্রামের অনেক পরিবারেই শোনা যায়। গ্রামের অন্যান্য পেশাজীবীদের অবস্থা মোটামুটি কৃষকের মতোই ছিল। মূলত, মহাজনের কাছে ঋণগ্রস্ত বাংলার কৃষকগণ শুধু কঠোর পরিশ্রম করে ফসল উৎপন্নই করত। রাজস্বের দায়ভার বহনের পর তারা সারা বছর দুবেলা পেট ভরে খেতে পারত না। তাদের এই অভাব-অনটন যেন কখনও শেষ হবার নয়, যা ছিল চিরন্তন।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* (১০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দ-১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ) কলকাতা, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৯৯৩, পৃ. ২১৬; ইরফান হাবীব, *মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস-একটি সমীক্ষা,* অনুবাদক, সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০০৪, পৃ. ২৬

২. অনিরুদ্ধ রায়, *সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস একটি সমীক্ষা,* কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭, পৃ. ১১; সৌমিত্র শ্রীমানী, *সুলতানী রাজত্বকালে ভারত,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০৪, পৃ. ১৬৪

৩. ইরফান হাবীব, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮

৪. K M (Kunwar Muhammad) Ashraf, *Life and Conditions of the People of Hindustan,* New Delhi, Oriental Publishers, 1959, p. 113

৫. *Ibid,* P. 113-114; ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি,* ঢাকা, মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৯, পৃ. ৮৯

৬. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ),* ২য় খন্ড, কোলকাতা, সরকার পাবলিশিং হাউজ, ২০০৬, পৃ. ২০৬

৭. K M Ashraf, *Op.cit,* p. 114

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২২৪-২২৫

৯. K M Ashraf, *Op.cit,* p. 114

১০. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (১২০০-১৮৫৭, মুসলিম বিজয় থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত), ঢাকা, বড়াল প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ১২২-১২৩

১১. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ২৫১; K M Ashraf, *Op.cit,* p. 115

১২. Kamrunnesa Islam, *Aspects of Economic History of Bengal,* Dhaka, Asiatic Society of Bangladesh, 1984, p.110

১৩. K M Ashraf, *Op.cit,* p. 115

১৪. *Ibid,* p. 116

১৫. R C Majumder, H C Ray Chaudhuri & Kalikinkar Datta, *An Advanced History of India,* New Delhi, SG Wasani for Macmillan India Limited, 1982, p.389-392; অতুলচন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ২১৬

১৬. শ্রী বৈদ্যনাথ বসু , *মধ্যযুগে ভারত*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০, পৃ. ৯০-৯৯

১৭. Tapon Ray Chowdhury & Irfan Habib (ed.) *The Cambridge Economic History of India,* Delhi, 1982, vol.1, p. 68

১৮. সুলতান ফিরুজশাহ তুঘলক, *ফুতূহাত-ই-ফীরুজশাহী*, অনুবাদক, আব্দুল করিম, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৮৯, পৃ, ৮৯ ; সৌমিত্র শ্রীমানী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬২

১৯. এ কে এম আবদুল আলিম, *ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১০৪; সৌমিত্র শ্রীমানী, *প্রাগুক্ত,* পৃ, ১৬৩-১৬৪

২০. সৌমিত্র শ্রীমানী, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬৪

২১. *ঐ*, পৃ. ১৮৬

২২. সুবোধ কুমার মুখ্যোপাধ্যায়, *মধ্যযুগে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন,* ঢাকা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৫-৬

২৩. জিয়াউদ্দিন বারানী, *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী*, অনুবাদ, গোলাম সামদানী কোরায়শী, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ. ৪২৩

২৪. W H Moreland, *The Agrarian System of Moslem India*, Allahabad, Delhi, Central Book Depot, 1968, p. 33

২৫. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ৪১১; Chowdhury & Irfan Habib (ed.) *op.cit,* p. 48 ; জিয়াউদ্দিন বারানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪

২৬. Ibn Battuta, *The Rehla of Ibn Battuta*,(eng.tr.) Agha Mahdi Hussain, Borada, 1976, p. 201-220 ; সুবোধ কুমার মুখ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯

২৭. জিয়াউদ্দিন বারানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩

২৮. Sunil Sarma, *Amir Khusraw, The poet Sufis and sultans*, England, One World Publication, Oxford, 2006, p. 85

২৯. V.D. Mahajan, *History of Medival India*, New Delhi, S. Chand & Company Ltd., 1988, P. 375

৩০. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal,* vol. 1, Karachi, Pakistan Historical Society Pub., 1963, p. 389; M P Srivastava, *Society and Culture in Medival India 1206-1707,* Alahabad, 1975, P. 126-127; অতুল চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬-২১৭

৩১. Abul Fazl, *Ain-I-Akbari*, voll.11, H.S Jarret, Calcatta, The Asiatic Society, 1949, p.74

৩২. M R Tarafder, *Trade, Technology and Society in Medieval Bengal,* ICBS, DU, 1995, p. 82

৩৩. মুকুন্দরাম বলেন যে, মালি বসে গুজরাটে---------মালঞ্চে সদাই খাটে। কালকেতু উপাখ্যান, পৃ. ১০০

৩৪. আশুতোষ দাস (সম্পাদিত), দ্বিজরামদেব বিরচিত, *অভয়ামঙ্গল*, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ.৭৮

৩৫. কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বিরচিত, মুহাম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পাদিত, *কালকেতুর উপাখ্যান*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ২০১৭, পৃ.১০০

ফুলের পুটলি বান্ধে পুষ্পসাজি করি কান্ধে
দেই পুরে দেবদেবীঘর।।

৩৬. K M Ashraf, *op.cit,* p.121.

৩৭. *Ibid,* p. 122; মুকুন্দরাম, কবিকঙ্কণচণ্ডী, সম্পাদনা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, কলকাতা, ১৯৭৪, পৃ.৮২; সুবর্ণ বণিক বসে রজত কাঞ্চন কষে পোড়ে ফোড়ে দেখিআ সংশয়।

কিছু বিচে কিছু কিনে নিত্য নিত্য বাড়ে ধনে
পুর মধ্যে জাহার নিলয়।

৩৮. শ্রী মিহির কুমার রায়, *ভারতের ইতিহাস*; তুর্কো-আফগান যুগ, ১২০৬-১৫২৬, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬, পৃ. ২৯৯

৩৯. সুবোধ কুমার মুখ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬

৪০. মুকুন্দরাম কামার শ্রেণির বর্ণনা দেন,

কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল। কবিকঙ্কণ, *চণ্ডীমঙ্গল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৪১. Md. Akhtaruzzaman, *Society and Urbanization in Medieval Bengal,* Dkaka, Asiatic Society of Bangladesh, 2009, p.333-334

৪২. V D Mahajan, *op.cit* p.376-377

৪৩. ইরফান হাবীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬

৪৪. K M Ashraf, *op.cit*, p.124

৪৫. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭

৪৬. Muhammad Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal*, vol. 1B, Riyadh, Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Dept. of Culture Pub., 1985, p. 821

৪৭. Md. Aktaruzzaman, *op.cit*, p.302, 303 ; Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, p. 274-286; আবদুল মমিন চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৪৮. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

৪৯. ওয়াকিল আহমেদ, *বাংলায় বিদেশী পর্যটক*, ঢাকা, গ্লোব লাইব্রেরী (প্রা:) লিমিটেড, ২০০০, পৃ. ২৫

৫০. *ঐ*, পৃ. ২৫-২৬

৫১. মো: এমরান জাহান, *মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা, কবির পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ. ৩১৮

৫২. Muhammad Abdur Rahim, *op.cit*, p. 296; মো: এমরান জাহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০